সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষাচিন্তায় বাংলা ভাষা

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম[*]

সারসংক্ষেপ : বিজ্ঞানী পরিচয়ের বাইরে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বড় পরিচয় তিনি একজন শিক্ষাবিদ। বিজ্ঞান সাধনা ও শিক্ষা নিয়েই তিনি সারাজীবন কাটিয়েছেন। অধ্যাপনা ও দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙালির মুক্তি ও উন্নতির প্রধান উপায় শিক্ষা। তবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া কোনো শিক্ষা নয়, ভারতীয়দের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি সহযোগে স্বনির্ভরতা অর্জনের শিক্ষা। নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাদর্শন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীর শিক্ষাবিষয়ক উন্নত চিন্তাধারা তাঁকে শিক্ষাচিন্তায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে অবারিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক ও মানবতাবাদীরূপে গড়ে তোলা। সত্যেন্দ্রনাথ বসু মনে করতেন, ছাত্রদের মৌলিক চিন্তার বিকাশের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান একান্ত জরুরি। স্বদেশি ও বিদেশি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছেন যে, বিদেশি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর সেসব গুরুত্বপূর্ণ মতামত নিয়ে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। শিক্ষার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা এর উদ্দেশ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) বিজ্ঞান সাধক, কোয়ান্টাম স্ট্যাটিসটিক্সের উদ্ভাবক, পদার্থতত্ত্ববিদ। তিনি 'সত্যেন বোস','বিজ্ঞানী বোস' নামে সর্বাধিক পরিচিত। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে 'বোস সংখ্যায়ন' সম্পর্কিত তাঁর গবেষণাপত্রটি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন অনুবাদ করে একটি জার্মান পত্রিকায় প্রকাশ করলে তা বিজ্ঞানজগতে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রসায়নবিদ বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক ডি.এন মল্লিক, অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষক। মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিনবিহারী সেন, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ তাঁর সহপাঠী বন্ধু। তিনি সেকালের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী — অটোহান, মাদামকুরি, আইনস্টাইন প্রমুখের সান্নিধ্য পেয়েছেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ বলা হয়। তিনি মনে করতেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান

[*] পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষা গবেষক সমিতি, ঢাকা।

শিক্ষা সত্যকে উদঘাটন করে বাস্তব সম্পর্কে যথার্থ ধারণা দেবে, যা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেবে। তাঁর শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষকে যোগ্য ও সুনাগরিক করে গড়ে তুলে জাতীয় উন্নতি নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি বাংলা ভাষায় 'বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে', 'মাতৃভাষা', 'আমাদের উচ্চ শিক্ষা ও মাতৃভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এসব ভাষণের বেশির ভাগের বিষয়ই ছিল শিক্ষা। তিনি 'জগদীশচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা', 'মেঘনাদ সাহা স্মারক বক্তৃতা' 'মহেন্দ্রলাল স্মারক বক্তৃতা' প্রভৃতি ভাষণে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তন ও জনশিক্ষা বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সাধারণের মধ্যে সহজ করার জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ, স্মারক বক্তৃতা ও সমাবর্তন ভাষণ মূল্যায়ন করলে বাংলা ভাষায় তাঁর শিক্ষাচিন্তার মৌলিক পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মজীবন

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম ১৮৯৪ সালের ১ জানুয়ারি উত্তর কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের পাশে ২২ ঈশ্বর মিল লেনে। তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন রেলওয়ের কর্মচারী এবং মা আমোদিনী দেবী ছিলেন গৃহিণী। পিতার হাত ধরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম স্কুলে যান এবং নর্মাল স্কুলে ভর্তির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। স্কুলে ভর্তির আগে তিনি নিজ গৃহে মাকে নানা প্রশ্ন করে ব্যস্ত রেখেছেন। তিনি নর্মাল স্কুল ছেড়ে কলকাতা হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা (১৯০৯) দেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি এফ. এ (১৯১১) পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং গণিতে অনার্সসহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থানসহ বি. এ. পাস (১৯১৩) করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু মিশ্রগণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. ডিগ্রি লাভ (১৯১৫) করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে মিশ্রগণিতে ও পদার্থবিদ্যায় গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্যার আশুতোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা ও ফলিত গণিত বিষয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এখানে পদার্থবিদ্যার রিডার হিসেবে যোগদান করেন। কালক্রমে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘ চব্বিশ বছর তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা ও এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির ওপর গবেষণা করে বিজ্ঞান জগতে বরেণ্য হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগকে আশ্রয় করে এদেশের মাটিতে তাঁর গবেষণা খ্যাতির সূচনা হয় এবং তাঁর অসামান্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৯২৪-এ 'প্ল্যাঙ্কস ল অ্যান্ড দি লাইট

কোয়ান্টাম হাইপোথিসিস' নামে তাঁর পেপার প্রকাশিত হয়। এ পেপারটি পাঠ করে তখনকার সেরা বিজ্ঞানী আইনস্টাইন চমৎকৃত হন এবং তিনি (আইনস্টাইন) এটি জার্মান ভাষার অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সূত্র অনুসারে তাপে অণুরা সরে দাঁড়ায় এবং তাদের মধ্যে একটা গতির সঞ্চার হয়। এর ফলে উত্তপ্ত পদার্থ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বেড়ে যায়। 'তাঁর এই অণু গবেষণার পূর্বে এ পদ্ধতিটি (তাপের দ্বারা আয়তন বৃদ্ধি) 'ম্যাকসওয়েল-বলজম্যান স্টাটিসটিকস' নামে পরিচিত ছিল। এই বিজ্ঞানীদ্বয় পদার্থের অণুকে একেবারে পৃথক পৃথকভাবে ধরতেন, যেন তাপ পেলে অণুগুলি আলাদা আলাদাভাবে তাদের উত্তপ্ত আচরণ আরম্ভ করে দেয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর নতুন পদ্ধতিতে অণুর এ স্বাতন্ত্র্যটি অস্বীকার করে দেখালেন যে, এরা এক-একটা গুচ্ছে ঘোরাফেরা করে, একেবারে স্বতন্ত্র ও এককভাবে নয়। অণুর ক্ষুদ্র একটি অংশ যে প্রোটন — তিনি তার উপর তাঁর এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লব নিয়ে আসেন। তিনি আপেক্ষিক তত্ত্বের কতকগুলি জটিল গাণিতিক সমীকরণের পূর্ণ সমাধান করে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অনন্য কীর্তি স্থাপন করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৯২৯ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি এবং ১৯৪৪ সালে এর মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত খয়রা অধ্যাপক হিসেবে এবং কয়েক বছর স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের ডিন পদে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'এমিরিটাস প্রফেসর' পদে নিয়োগ দেয়। এরপর তিনি দুই বছর (১৯৫৬-১৯৫৮) বিশ্বভারতীয় উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৫৮ সালে তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু পদার্থবিদ্যায় ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি ১৯৬২ সালের আগস্টে 'হিরোশিমা-নাগাসাকি দিবস' উপলক্ষ্যে জাপানে আয়োজিত আন্তর্জাতিক 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সম্মেলনসহ বিভিন্ন দেশে শান্তি-সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' এবং ভারত সরকার-কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। তিনি কলকাতায় 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠা এবং মাসিক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানী হলেও শিক্ষা, সাহিত্য, ও সংগীতে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেহালা এবং এসরাজ বাজাতেন; 'সবুজপত্র', ও 'পরিচয়' সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান সাধনা ও শিক্ষা নিয়েই সারাজীবন কাটিয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণাই ছিল তাঁর মুখ্য বিষয়। তাঁর গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানবকল্যাণ। এ কল্যাণবোধই তাঁকে শিক্ষাচিন্তায় নিমগ্ন করেছে। মানুষের প্রতি

দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে তিনি উপলব্ধি করেন যে বাঙালির উন্নতি ও মুক্তির প্রধান উপায় শিক্ষা। তাই তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে অবারিত করার জন্য শিক্ষাচিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু যখন শিক্ষা বিস্তারের কাজে হাত দেন তখন সামনে ছিল তাঁর পূর্বসূরি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষী ও কর্মযোগীদের শিক্ষা বিষয়ক উন্নত চিন্তাধারা। অন্যদিকে নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সচেতন ছিলেন। ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া ইংরেজি শিক্ষানীতির গলদ অনুধাবনে তাঁর অসুবিধা হয়নি। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> আমি প্রায় সারাজীবন শিক্ষা নিয়ে কাটিয়েছি। যখন আমরা ছাত্র ছিলাম তখন মনের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল যে — যে বিজ্ঞানের চর্চা করে প্রতীচ্য এত উন্নতি করছে, আমাদের দেশে সেটা শীঘ্র চালু হবে এবং আমরা জীবন উৎসর্গ করব সে সব জিনিস দেশের মধ্যে আনতে। প্রায় ষাট বছর আগে যখন দেশে স্বদেশী আন্দোলন হয় তখন দেশের মুনশি এবং যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন সেইসব নায়কেরা মনে করেছিলেন যে জাতীয় বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অন্তত বাংলাদেশের মধ্যে স্বদেশী শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপন করবেন। বহু বছর চলে গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তার অনেক সংকীর্ণ হয়ে রয়েছে। অন্য দেশে গেলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। সব দেশেই চেষ্টা চলছে মাতৃভাষার মাধ্যমে, যে-ভাষা সবাই বোঝে তার উপর বুনিয়াদ করে, শিক্ষার ব্যবস্থা করবার। সব জায়গায়ই এই রীতি চালু হয়েছে। মধ্যযুগে অবশ্য অন্য ভাষা অবলম্বন করে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল; জ্ঞানী-গুণী লোকরাই তার সুযোগ পেতেন। এর অসুবিধা ছিল এই যে, সাধারণ লোকে বুঝতে পারত না। তার জন্য লোকের দরকার হত। তারা যেমন বুঝত সেইরকম সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দিত। এইভাবে কিন্তু দেশের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার বড্ড আস্তে আস্তে হত। আজকের যুগে একদিকে যেমন লোকে চেষ্টা করছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে দেশকে বড় করতে, মানুষকে নানারকম সুখ-সুবিধা দিতে, তেমনি আবার এটাও বুঝেছে যে কেবল একটা শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান যদি আবদ্ধ থাকে তা হলে উন্নতি তত দ্রুত হয় না। কাজেই আজ যখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তখন আমাদের ভালো করে ভেবে দেখতে হবে কী করে দেশের ভিতর তাড়াতাড়ি শিক্ষার বিস্তার হবে। যদি চেষ্টা করা যায়, তবে এদেশের মধ্যে থেকে অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা দূর করা যেতে পারে এটা যাঁরা ইতিহাস চর্চা করেন, তাঁরাই জানেন। (তপন, ২০০৬ : ৭৯)

বিজ্ঞানী সত্যেন্দনাথ বসু বিভিন্ন আন্তর্জাতিক 'বিজ্ঞান ও দর্শন' সম্মেলনসহ বিশেষ আমন্ত্রণে বিভিন্ন দেশে শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-ভাষণ প্রদান করেছেন। তাঁর সেসব ভাষণের বেশির ভাগের বিষয়ই ছিল শিক্ষা। ফলে শিক্ষা বিষয়ক তাঁর চিন্তা সমকালের মধ্য দিয়ে উত্তরকালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি শিক্ষাকে উন্নতির পূর্বশর্ত হিসেবে দেখতেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বাস করতেন জাতীয় উন্নতি সাধনে শিক্ষার বিকল্প নেই। তিনি দেখেছেন যে, বস্তু ও সংসার সম্পর্কে উদ্ভট ও অলৌকিক একটা ধারণা মানুষ বহু যুগ ধরে লালন করে আসছে; যা তাঁদের জীবনযাত্রাকে পদে পদে ব্যাহত করছে। তাদের সেই অলৌকিক বিশ্বাস মুক্ত করার একমাত্র পথ হচ্ছে, শিক্ষা। বিশেষ করে বিজ্ঞানশিক্ষা। যা সত্যকে উদ্‌ঘাটন করে বাস্তব সম্পর্কে মানুষকে প্রকৃত ধারণা দেবে এবং উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। তিনি বলেছেন : 'বিজ্ঞান আমাদের এটুকু শিখতে সাহায্য করে যে, প্রকৃতির মধ্যে যে সত্য লুকিয়ে আছে, বিজ্ঞান সে সত্যকেই উদঘাটিত করে দেয়। আমাদের মনের বাইরে কোনোকিছু ঘটে গেলেই সেটা কোনো দৈব দানবের কীর্তি হবে এমন কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে নিশ্চয়ই তার মূল কারণটা বেরিয়ে পড়বে। অসুখ করলেই যদি আমরা মনে করি যে, এ নিতান্ত দৈবের ঘটনা, দেবতার সন্তুষ্টি সাধন ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই এতে, তবে আমাদের টিকে থাকা শক্ত হবে' (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৪০৫ : ৮৬)। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচীন আদর্শভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে এদেশের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষার অধিক সম্প্রসারণ। এই লক্ষ্যে তিনি বাংলা ভাষায় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ

আমরা দেখি যে, ব্যক্তির জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারো কোনো দ্বিমত না থাকলেও শিক্ষার লক্ষ্য কী হবে সে বিষয়ে দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যের ওপর নির্ভর করার কারণেই এমনটি হয়। আবার ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য পরিবর্তিত হয় দেশ-জাতি-সময়ভেদে, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটপরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে। ১৮৩৫ সালে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষে পাশ্চত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। সে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল ইংরেজি-অভিজ্ঞ কর্মচারী তৈরি করা। যারা ইংরেজের অফিসে কেরানির পদ লাভ করবে। ইংরেজ শাসকদের চাপিয়ে দেওয়া ইংরেজি শিক্ষা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। ফলে এ সময় ইংরেজি স্কুলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা পাঠশালা গড়ে উঠেছে। ১৮৪০ সালে কলকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বাঙালি ছেলেদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি স্থাপন করেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> ১৮৩৫ সনে বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই বিধান দিয়া যান যে সরকার পরিচালিত সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজীর মাধ্যমেই এদেশবাসীকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে। আবার সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসীদের নিয়োগেরও তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান। এসব কারণে ইংরেজী শিক্ষার দিকেই অতঃপর সাধারণের বেশী ঝোঁক পড়িল। সরকারী বিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে ইংরেজীর চর্চা আরম্ভ হইল। এদেশের ধনী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাও কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে ইংরেজী স্কুল

> স্থাপন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বাংলা পাঠশালা এবং বাংলা শিক্ষা দুইয়েরই অত্যন্ত দুরবস্থা হইল। শিক্ষার এই ত্রুটি কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আগ্রহাতিশয়ে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা ১৮৪০, ১৮ই জানুয়ারী স্থাপন করিলেন। ... বাংলার মাধ্যমে ইউরোপীয় ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই পাঠশালার মূল লক্ষ্য। দেবেন্দ্রনাথও এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইলেন। (যোগেশচন্দ্র, ১৩৮৪ : ৩৩)

অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ উদ্যোগের সঙ্গে নিজের প্রত্যাশার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনিও চেয়েছিলেন এদেশে বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হোক। এ দিক থেকে তাঁর চিন্তা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের চিন্তার অনুকূল ছিল। এ কারণে শুরু থেকেই অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। এ পাঠশালার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বাংলা ভাষায় লেখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ানো হতো। অক্ষয়কুমার দত্ত ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় পুস্তক লিখে তা পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করতেন। কালক্রমে কল্যাণহীন ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে উঠেছে। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক লক্ষ্যানুসারী না হয়ে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেউ সেই শিক্ষা মেনে নিতে পারেননি। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রধান আপত্তি ছিল তিনটি (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩৮৯ : ১৬)। তিনি বলেছিলেন :

১. ঔপনিবেশিক শিক্ষার পেছনে কোনো সুচিন্তিত কেন, কোনোরকম শিক্ষাতত্ত্বই নেই। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো চিন্তা নেই, তদনুযায়ী কোনো পরিকল্পনা নেই। বরং বলা যায়, কুপরিকল্পনা আছে — সে হল শিক্ষা দিয়ে মানুষকে কেরানিতে পরিণত করা, ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির ক্রীতদাসে পরিণত করা। ফলে, সৃজনশীলতা, মুক্তি ও আনন্দ, শিক্ষার যা অপরিহার্য ভিত্তি, এ শিক্ষায় তা সম্পূর্ণ অবহেলিত। এক কথায়, এ শিক্ষা শিক্ষাই নয়, এ হল এক ধরনের বিষক্রিয়া।

২. এ শিক্ষার দাঁড়াবার কোনো ভুমি নেই। ঐতিহ্যের সঙ্গে, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে-দেশের চিত্তের সঙ্গে এ শিক্ষার কোনো যোগ নেই। অর্থাৎ এ শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে সত্য নয়।

৩. আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক হলেও, আধুনিকতার বাইরের খোলসটাই এর লক্ষ্য, আধুনিকতার মর্মসত্যের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কালের প্রবাহের সঙ্গে, ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে এই ঔপনিবেশিক কেরানি-তৈরির শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরের কোনো যোগ থাকা সম্ভব নয়।

ইংরেজ প্রবর্তিত সেই শিক্ষানীতি সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্পষ্ট ধারণা ছিল। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রকৃত লক্ষ্য কী হওয়া উচিত, তা তিনি জেনে বুঝে ঠিক করতে পেরেছিলেন। তাই ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

আমাদের প্রয়োজন দেশের লোকদের শিক্ষিত করা, যে সমস্ত বস্তু জ্ঞান তাদের কাজে লাগে, তাদের নীরোগ রাখে, বিত্তশালী করে, তাদের মুখের খাবার যোগায় — সেই জ্ঞান দেশের সর্বত্র স্বল্প আয়াসেই যেন পাওয়া যায়, এটাই আমি চাই। (তপন, ১৯৮৬ : ৯০)

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এ বক্তব্য থেকে শিক্ষার যে লক্ষ্য পাওয়া যায় তা হলো : জীবিকা নির্বাহের যোগ্যতা অর্জন ও মানুষের শারীরিক বিকাশ। তিনি মনে করতেন, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অবনতির জন্য দায়ী ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান' শীর্ষক ভাষণে বলেছেন :

নালন্দা ও তক্ষশীলার মতো আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ধারাবাহিকভাবে যে পারলৌকিকতার পোষকতা করা হত — যা ছিল আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মেরুদণ্ডস্বরূপ — তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত শাশ্বত সত্যের অতন্দ্র মনন, চিন্তন, নিদিধ্যাসনের উপরে। এরই ফলে ব্যক্তিবিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ করতে এবং পৃথিবীকে দু'দিনের পান্থশালা মনে করতে সক্ষম হতেন। আর উপলব্ধি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলত এই জীবনের দুর্ভোগ ও পরীক্ষা থেকে মুক্তিলাভের জন্য। এ ধরনের মনন চিন্তনের দার্শনিক উৎকর্ষ আমরা যতই তারিফ করি না কেন এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, এ জগৎ দুদিনের পান্থশালা, ক্রমাগত এই প্রচার পার্থিব ব্যাপারে ঔদাসীন্যের উদ্রেক করেছে। ভারতীয়রা এরই জন্য শীঘ্রই জাগতিক ব্যাপারে আধিপত্য হারাল এবং অনতিবিলম্বে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে গেল বর্বরদের হাতে। (তপন, ১৯৮৬ : ১০৮-৯)

আর এ কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ বসু চেয়েছেন প্রাচীন আদর্শ-ভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে কর্মমুখী শিক্ষা। তিনি মনে করতেন, 'ছাত্রদের অন্ন সংস্থানের যোগ্য করে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব' (তপন, ১৯৮৬ : ৯০)। এদিক থেকে তিনি তাঁর শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুসারী এবং বিবেকানন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম প্রচার করতে গিয়ে জাগতিক মঙ্গল ও শিক্ষা বিস্তারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, জীবনকে উপোসি রেখে পারলৌকিক মঙ্গলের পিছনে ছোটা মরীচিকার পিছনে দৌড়ানোর মতই নিরর্থক। এ সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন :

মনে পড়ে শিকাগো 'ধর্ম্ম মহাসভায়' ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারভিলাষী মিশনারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিয়াছিলেন যে ভারতবাসী ভাতের-এক মুঠি অন্নের কাঙ্গাল — ধর্মের কাঙ্গাল নহে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে আজ অন্ন প্রদান করিতে হইবে। কারণ, ক্ষুধার্ত্ত লোকদিগকে ধর্ম্মের কথা বলা, তা তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্র বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। [...] আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে সাধারণ কুলিমজুরও প্রতিদিন ৯/১০ টাকা রোজগার করে, আর ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক অনশন অর্ধাশনে দিনপাত করে। তাই স্বামীজি বলিতেন যে, যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর্ত্তে পারে না, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন যাপন করে সে জাতের আবার বড়াই। ধর্ম্ম কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে আগে 'জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হ'। (প্রফুল্লচন্দ্র, ২০১২ : ৫৫৭)

ক্ষুধার্ত অবস্থায় যে ধর্ম হয় না, তা তাঁর আগে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই এমন করে বুঝিয়েছেন। সেজন্য তিনি যে আন্দোলনের সূত্রপাত করে যান, তার অন্যতম আদর্শ ছিল সেবার মধ্য দিয়ে মানুষের মঙ্গল সাধন। সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো অংশই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। শিক্ষা বিস্তার ও নতুন ধর্মাদর্শ প্রচার দুটোতেই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দুটি আন্দোলন দেখা দেয় — মানবতাবাদ ও প্রকৃতিবাদ। এ দুটি আন্দোলনের প্রভাবে পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষার লক্ষ্য, প্রকৃতি ও পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। বিশ শতকে প্রয়োগবাদ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। এ সময় শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক একমত না হলেও আমরা প্রচলিত কয়েকটি লক্ষ্যের নাম করতে পারি। যেমন : ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধান, সমাজ সংরক্ষণ, জ্ঞানমূলক উন্নয়ন, কৃষ্টিমূলক উৎকর্ষ সাধন, চরিত্র গঠন, জীবিকা নির্বাহের যোগ্যতা অর্জন, আত্মনির্ভরতা অর্জন প্রভৃতি। অন্যদিকে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার লক্ষ্যও স্থির হতে দেখা যায়। তা হলো — 'শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং নৈতিক দিকগুলির সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠুতম ও সর্বোত্তম পরিণতিতে পৌঁছাতে তাকে সাহায্যে করে' (অরুণ, ১৯৮৮ : ৪১-৪২)। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষার লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'এমনভাবে আজ শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত করা চাই — যাতে শিক্ষান্তের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কাজের জন্য তাদের ডাক আসে' (তপন, ২০০৬ : ৯০)। সত্যেন্দ্রনাথের বক্তব্যসমূহ বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষা। তাঁর শিক্ষাচিন্তা থেকে শিক্ষার যে লক্ষ্যসমূহ পাওয়া যায় তা হলো — 'জীবিকা নির্বাহের যোগ্যতা অর্জন, শারীরিক বিকাশ, জাতীয় উন্নতি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন এবং মানুষকে সুনাগরিক ও মানবতাবাদী রূপে গড়ে তোলা।' (তপন, ২০০৬ : ১১১)

শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু মানবকল্যাণে বিজ্ঞানে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে ওঠেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে জনমত গঠনে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আশুতোষের সর্বোচ্চ সাফল্যের অন্যতম ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষায় উৎসাহদান, বিশেষ করে বাংলাভাষা শিক্ষায়। '১৯০৬ সালে যখন নতুন নিয়মাবলি তৈরি হল তখন বিএ স্তর পর্যন্ত অধ্যয়ন ও পরীক্ষায় মাতৃভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। পরবর্তী সময়ে আশুতোষ ভারতীয় ভাষা বিষয়ক একটি উচ্চতর বিভাগ সংগঠিত করেন' (শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ, ২০০৭ : ৩৯)। তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিয়েছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন এবং কর্তাব্যক্তিদের কাছে আবেদন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে তিনি বাংলা ভাষায় পড়িয়ে প্রমাণ করেছেন যে, এ ভাষায় পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়ও শিক্ষাদান

করা সম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করেছেন। আর সে কর্মসূচি সম্ভব কেবল বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে। কারণ বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক পেতে কোনো অসুবিধা হয় না। তিনি জাপান ও জার্মানির উদাহরণ টেনে বলেছেন যে, দেশ দুটির উন্নতির মূলে আছে শিক্ষার প্রসার। জাপানে তাদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক হওয়ার কারণে তাড়াতাড়ি শিক্ষা বিস্তার ঘটানো সম্ভব হয়েছে। অথচ জাপানি ভাষা আয়ত্ত করা বাংলা ভাষার তুলনায় অনেক বেশি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। কারণ, বাংলা ভাষায় যেখানে অল্পসংখ্যক বর্ণ দ্বারাই সব বাক্য লেখা যায় সেখানে জাপানি ও চৈনিক সব মিলিয়ে রয়েছে কয়েক হাজার অক্ষর। এজন্য আমাদের দেশে যেখানে মাতৃভাষা বাংলা বছরখানেক বা বছর দুয়েকের মধ্যেই আয়ত্তের মধ্যে এসে যায় সেখানে জাপানি ছেলেমেয়েদের জাপানি ভাষা শিখতে গড়ে সময় লাগে প্রায় ছয় বছর। এসব যুক্তি সামনে রেখে সত্যেন্দ্রনাথ বসু মনে করতেন, বাংলা ভাষায় বাঙালি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ অনেক সহজ। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের সাধারণ মানুষ মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হোক। বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জন করুক, যা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে, তাঁদের মুখের খাবার জোগায়। তাঁরা আয়ত্ত করুক সেই জ্ঞান যা দেশের সর্বত্র স্বল্প আয়াসেই পাওয়া যায়। স্বল্প আয়াসে সবার কাছে শিক্ষাকে কেবল মাতৃভাষাতেই (বাংলা ভাষাতে) পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, ইংরেজি ভাষায় তা মোটেও সম্ভব নয়। তিনি মনে করতেন ছাত্রদের মৌলিক চিন্তার বিকাশের জন্য মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাদান অপরিহার্য। 'বিদেশী ভাষাই হল আমাদের দেশের সাক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হলে মুখস্থ করবার প্ররোচনা দেয় ছাত্রদের এবং এর ফলে তাঁদের মৌলিক চিন্তার প্রসার ঘটতে বাধার সৃষ্টি হয়' (তপন, ২০০৬ : ৯৮)। বিদেশি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হলে শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতা হ্রাস পায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার একটাই ফল, –বুঝে না-বুঝে মুখস্থ করা। আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন নিজের দেশে। সেখানেও এইরকম হয়েছিল যে অনেক বিদ্যের ভারে তাঁকে মুমূর্ষু হয়ে পড়তে হত এবং তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে, 'পরীক্ষা দেবার পর এক বছর লাগল আমাকে এই যা মুখস্থ টুখস্থ করে পাশ করতে হয়েছে তার থেকে আবার একটা মনোভাব ফিরিয়ে আনতে, যাতে আমি সব বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তি সামনে রেখে, উদ্ভাবনী শক্তি অনুসারে তাকে ভাবতে পারি।' তিনি আরও একটা কথা বলেছেন যে, নানারকম নিয়ম, সিলেবাস ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ভালো করে বেঁধে প্রতি ঘণ্টায় 'এই করতে হবে' রুটিন রেখে এবং প্রতি বৎসর কি প্রতি মাসে পরীক্ষা দিতে হবে–এরকম করলে আমাদের দেশের যে উদ্ভাবনী শক্তি সেটা ঠিক বেরুবে না। সৃজনীশক্তি চায় স্বাধীনতা, সে-স্বাধীনতা এ নয় যে পরীক্ষা হলে বই নিয়ে গিয়ে উত্তর লেখা–কিংবা মনমত প্রশ্ন না পেলে খাতাপত্তর ছিঁড়ে দিয়ে উঠে চলে আসা। এটা ঠিক নয়। তিনি ভেবেছিলেন যে মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে, যে বিজ্ঞানসাধনা করতে এসেছে, সে সেইরকম সাধকের মনোবৃত্তি আছে বলেই এইরকম বিরস বিষয় নিয়ে আলোচনা করেত রাজি হয়েছে।

> এগিয়ে চলতে চেয়েছে এইরকম বন্ধুর পথে। অন্তত তাকে এই স্বাধীনতাটুকু দাও যাতে এর ভেতর থেকে তার চিন্তাকর্ষক বলে যা যা মনে হয় সেই জিনিস নিয়ে তারই রস সংগ্রহ করতে সে পারে। এইরকম ধরনের স্বাধীনতা না হলে সেখানে যাকে আমরা বলি talent, যেটা আজকাল বসু বিজ্ঞান মন্দিরে খোঁজাখুঁজি চলছে বলে শুনেছি, সেটা বিকশিত হবে না। কেননা একটা বাঘ বা ভাল্লুককে ধরে নিয়ে এসে যদি অনবরত বলা হয় 'খিদে থাক আর না-থাক তোকে গুঁতিয়ে খাওয়াব' তা হলে তার ক্ষুধা চলে যায়।' (তপন, ২০০৬ : ১০৪)

তিনি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারে মত দিয়েছেন। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতায় তিনি নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, 'ছাত্র-শিক্ষক খোলাখুলি আলোচনা ও একযোগে কাজ করার মাধ্যমে যথেষ্ট সময় বাঁচিয়ে ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ়তর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। তবে সে আলোচনা ও শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হলে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীরা অনেক সময় নিজের জিজ্ঞাসা ঠিকমত শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করতে পারে না এবং শিক্ষকও নিশ্চিন্ত হতে পারেন না যে, তাঁর বক্তব্য শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে কি-না। ফলে, বিদেশি ভাষায় শিক্ষাদান ছাত্রকে মুখস্থ করতেই বেশি প্ররোচিত করে। তাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের সারতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সম্যক ধারণা জন্মায় না। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলতেন — 'দশভুজার পাদপদ্মে রক্তজবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপূজার অযোগ্য' (স্বপনকুমার, ২০০৭ : ৩৯)। এ সময় বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের বিপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি দেখানো হয় এই বলে যে, বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ উপমহাদেশের ভাষাগুলোর মাধ্যমে শিক্ষাদান করানো সম্ভব নয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসু এ যুক্তি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বিদেশি উদাহরণ সহযোগে খণ্ডন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞান বাংলায় পড়িয়ে প্রমাণ করেছেন যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের জটিল বিষয় শিক্ষাদান সম্ভব। বাংলায় শিক্ষাদানের জন্য তিনি সহকর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন (তপন, ২০০৬ : ৭৫)। তিনি তাঁর তরুণ সহকর্মী কাজী মোতাহার হোসেনকে একবার বলেছিলেন : 'বাংলায় একখানা পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক বই লেখ, তা দেখে ছাত্রেরা পরীক্ষণের উদ্দেশ্য প্রক্রিয়া প্রভৃতি ভালো করে বুঝতে পারবে। এখন ওরা ইংরেজি বই দেখে পরীক্ষণ বুঝতে চায়, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারে না বলে ভুল করে' (তপন, ২০০৬ : ৪৩)। মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা কি সম্ভব? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন — 'যাঁরা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না; নয়তো বিজ্ঞান জানেন না।' (তপন, ২০০৬ : ৯-১০)

বাংলা ভাষায় শিক্ষাকে সফল করার জন্য তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরের মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় সম্পর্কে তিনি মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয়ের মধ্যে আছে বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের রীতি, বিভিন্ন ভাষা

থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অনুবাদ করে প্রকাশের প্রচলন করা, অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় নানা বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যবই রচনা, প্রয়োগবিদ্যা; যেমন আইন অনুষদ খুলে বাংলায় শিক্ষাদানের প্রয়াস গ্রহণ করা এবং মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নে বাংলা প্রচলনের দায়িত্ব পালন করা। উল্লিখিত করণীয়গুলি যে বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রসারের জন্য সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক, বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলা ভাষা ব্যবহার-বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন

ভারতবর্ষে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা কঠিন। কারণ ভারতীয় ভাষাগুলোতে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত পরিভাষা নেই এবং ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতের যে চাহিদা আছে, বাংলা ভাষায় শিক্ষিতের তা নেই। এ দুটি অভিযোগ সামনে রেখে তখনকার শিক্ষিত সমাজ বাংলা ভাষায় শিক্ষার চিন্তা না করে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষে তাঁদের যুক্তি দেখান। সত্যেন্দ্রনাথ বসু সেইসব যুক্তির বিরোধিতা করে বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁর মত তুলে ধরেন। পরিভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> এই প্রসঙ্গে পরিভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা একটা অজুহাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিভাষার প্রয়োজন ক্ষেত্রবিশেষে আছে ঠিকই, তবে পরিভাষাকে নিমিত্ত করে শিক্ষা পরিকল্পনাকে স্থগিত রাখাও অনুচিত। গত দেড়শো বছর ধরে পরিভাষা রচনার চেষ্টা কম হয়নি। সে-মূলধন নিয়েই আপাতত কাজে নেমে যাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া পরিভাষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার আদৌ কোনো যুক্তি আছে কি না ভেবে দেখা দরকার। পরিভাষা অনেকটা নামধাতুর মতো। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের চেয়ে ব্যবহারিক অর্থই অধিক গণ্য। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অনেকাংশ পাশ্চাত্য দেশ থেকে নেওয়া। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে যে-নামে চিহ্নিত করছে, সেই তথ্য, যন্ত্র ধারণাকে আমরা সেই না-সমেত গ্রহণ করেছি। সেই নামের প্রতিশব্দ সন্ধান করা অনেকটা টেলিফোনকে দূরভাষ যন্ত্র বলার মতোই বাতুলতা। অপরের কাছ থেকে নেওয়া জিনিস অপরের দেওয়া নামেই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিদ্যার ও বৃত্তি নিয়মিত চর্চার ফলে বাংলা পরিভাষা যথাকালে দেখা দেবে। ততদিন পর্যন্ত ইংরেজি পরিভাষাকে অন্ত্যজ জ্ঞান করার কোনো কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ইংরেজি পরিভাষা যদি বাংলায় সাজ-বদল করে, তাতে বাংলার লাভ। কোনো ভাষাই চারদিকে দেওয়াল তুলে সমৃদ্ধ হতে পারে না। (তপন, ২০০৬ : ৮৬)

সত্যেন্দ্রনাথ বসু পরিভাষার সমস্যা দূর করতে প্রয়োজনে ইংরেজি টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দেখান। পরিভাষা নিয়ে যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কাজ করছেন তাঁদের এ বিষয়ে আরও সক্রিয় হওয়ারও তিনি পরামর্শ দেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরের শিক্ষার ভাষা যাঁরা করেছেন তাঁরা এগিয়ে এলে পরিভাষার অভাব থাকবে না। তাঁর মতে, 'বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক

ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভাষাতত্ত্ব পড়ানো হয়। এই বিদ্যায় পারদর্শী ছাত্রদের কর্মক্ষেত্র বর্তমানে খুবই সীমাবদ্ধ। এরা যাতে অনুবাদ-চর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে, সেইজন্য স্নাতকোত্তর স্তরে বিশেষ জ্ঞান লাভের সুযোগ থাকা দরকার। রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যথোচিত মর্যাদা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদে বিশেষজ্ঞ ভাষাবিদদের প্রয়োজন বাড়বে বলেই মনে হয়' (তপন, ২০০৬ : ৮৭)। তখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরের মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে বাংলা ভাষার সর্বত্র প্রয়োগের কাজে রবীন্দ্রভারতীর ভূমিকা তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এ বিষয়ে ভালো কিছু আশা করেন। তাঁর সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য পাঁচটি পরামর্শ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কয়েকটি ভার অর্পণ করেন। তিনি বলেন :

> ক. এই বিশ্ববিদ্যালয় যত শীঘ্র সম্ভব একটি অনুবাদ ফ্যাকাল্টি খুলবে। এই বিভাগে বিভিন্ন ভারতীয় ও অভারতীয়, প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা থেকে নানা বিষয়ে বাংলায় অনুবাদ করার নীতি ও পদ্ধতি শেখানো হবে। এই শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে স্নাতকোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা। এই পাঠক্রমে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী উপাধিলাভ করবে।
>
> খ. অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় নানা বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যবই রচনার দায়িত্ব থাকবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
>
> গ. বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্যতম কাজ হবে বিভিন্ন বিদেশী ও ভারতীয় ভাষার নানা বিষয়ক ক্লাসিক গ্রন্থ অনুবাদ করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ থেকে সস্তা দামে সেগুলি প্রকাশ করা।
>
> ঘ. প্রয়োগবিদ্যায় বাংলা প্রচলনের প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয় আইনশিক্ষার একটি ফ্যাকাল্টি খুলবে। বাংলা ভাষায় শিক্ষিত এখানকার আইনবিদ্যা এল. এল.বি. উপাধিধারীদের সমমর্যাদা লাভ করবে, হাইকোর্টের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তা ঘোষণা করতে হবে।
>
> ঙ. বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের অন্তত একটির পরিচালনার ভার নেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়, অবশ্য এ-বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির আইনগত কোনো বাধা থাকলে তা অপসারণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের দায়িত্ব থাকবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। (তপন, ২০০৬ : ৮৭-৮৮)

বাংলা ভাষায় শিক্ষা প্রসারের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছেন তিনি তাঁদের সাহায্য নিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শ দিলেন। কারণ, সেসব প্রতিষ্ঠানের চিন্তা ও চেষ্টার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বড় প্রতিষ্ঠান যুক্ত হলে কাজটিতে আরও গতি আসবে। কারণ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপারে নানা

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন ও প্রচারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন — 'অনেক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা যে এখনও ইংরেজির দায়ভার থেকে মুক্ত হতে পারছি না, তার মূল কারণ এই যে, আমাদের শিক্ষাকাণ্ডের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল ওই বিদেশি ভাষা' (তপন, ২০০৬ : ৮৭)। তিনি চাইলেন ইংরেজির দায়ভার থেকে এদেশের মানুষকে ছাড়িয়ে এনে বাংলা ভাষার সঙ্গে বেঁধে দিতে। আর এ কাজটি করতে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সঙ্গে সরকারকে জুড়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন :

> শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রয়োগ ও প্রচলনের এই প্রয়াসটি একান্তভাবে শিক্ষা বিভাগের দায় ও দায়িত্ব বলে গণ্য না করলে এবং সরকারি ও বেসরকারি দৈনন্দিন ব্যবহারের ব্যাপক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেতনভাবে একই সঙ্গে চেষ্টা না করলে, শিক্ষাক্ষেত্রের তেমন কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে না। শিক্ষার্থী যদি তার পারিপার্শ্বিক জগতে নিয়ত দেখে যে ইংরেজি নবিশের বাজারদর বাংলা নবিশের তুলনায় অনেকগুণ বেশি, তা হলে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, সে বা তার অভিভাবকরা ইংরেজির দিকে ঝুঁকবেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। (তপন, ২০০৬ : ৮৮)

আমরা জানি যে, বাঙালি শিক্ষার ফল হাতে হাতে পেতে চায়। সেই ফল মূলত অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন। ইংরেজি শিক্ষা লাভে যদি সে সুযোগ থাকে তারা সেদিকেই মনোযোগী হবে। আর একই রকম সুযোগ যদি বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা যায় তাহলে সহজেই তাঁরা বাংলা ভাষার দিকে ঝুঁকবে। আর সরকার যদি এ ভাষায় শিক্ষাকে বাধ্যতামুলক করে সে ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রসার সম্ভব। তা না হলে পারিপার্শ্বিকের প্রতিকুল ও বিভ্রান্তিকর প্রভাব দূর করা যাবে না। আর তা না হলে বাংলা ভাষায় সর্বাঙ্গীন শিক্ষার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না। এসব দিক বিবেচনা করে সত্যেন্দ্রনাথ বসু তখনকার সরকারকে কয়েকটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> ক. সরকারি ভাষা আইন অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে, সরকার প্রশাসনিক দপ্তরগুলির সব স্তরে যেন জানিয়ে দেন যে, একটি নির্দিষ্ট তারিখের পর বাংলায় ছাড়া অন্যভাবে বক্তব্য পেশ করলে তা গ্রাহ্য করা হবে না। এইসঙ্গে সরকার যেন হাইকোর্টকে অনুরোধ করেন, যাতে তাঁরা আপাতত মফঃস্বল স্তরের আদালতের সব কাজকর্ম বাংলায় চালাবার অনুমতি দেন।
>
> খ. রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বাংলায় পরীক্ষা গ্রহণ প্রবর্তন করার নির্দেশ দিতে হবে।
>
> গ. রাজ্য বেসরকারি সওদাগরি ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাংলার প্রাধান্য যাতে সুরক্ষিত হয়, তার জন্যে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
>
> ঘ. আইন প্রণয়ন করে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতে হবে তারা

> যেন একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের পরিচয় জ্ঞাপক সাইনবোর্ড, নোটিস, প্রচারপত্র ইত্যাদি বাংলায় রূপান্তরিত করে। অন্য ভাষা যদি রাখতে হয় সেই ভাষা বাংলার পরে থাকবে। এই আইনের প্রাথমিক প্রয়োগক্ষেত্র হবে কলিকাতা।
>
> ঙ. রাজ্যের প্রচার দপ্তর থেকে বাংলা গ্রহণের সপক্ষে নিয়মিত প্রচার চালাতে হবে। এই কাজে আকাশবাণীর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকেও নিয়োগ করতে হবে।
>
> চ. দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রচলনের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে আরও অনেক কিছু কর্তব্য জড়িত এবং সেইসব কর্তব্য প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা বিভাগের আওতায় আসে না। শিক্ষার সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভাষাগত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এবং ভাষাসংক্রান্ত কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত থাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র সংস্থা বা কমিশনের প্রয়োজন। এই সংস্থা বা কমিশন এমনভাবে গঠিত হবে যাতে তা কোনো একটি সরকারি বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে না, অথচ সরকারের সকল বিভাগে ও বেসরকারি সব মহলে বাংলা ভাষা প্রচলন করার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারবে। (তপন, ২০০৬ : ৮৮)

শিশুর বিকাশে বাংলা ভাষার গুরুত্ব

আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে — মানবশিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর পরিপূর্ণতা দানই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। শিশুশিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে শিশুকে জেনে শিশুর প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা দেওয়া। শিশুর রুচি, প্রবণতা, সামর্থ্য প্রভৃতি না জেনে কোনো শিক্ষায় শিশুকে বাধ্য করা উচিত নয়। শিক্ষাদান কালে শিশুকে নিষ্ক্রিয় রেখে, তার ওপর জোর করে জ্ঞান চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। মধ্যযুগের অবসানে ইউরোপে এরূপ গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের চিন্তা শুরু হয়। দার্শনিক রুশো প্রথম এ ব্যাপারে বৈপ্লবিক মত প্রদান করেন। তাঁর মতে — 'শিক্ষা হবে শিশুর প্রকৃতি অর্থাৎ শিশুর মনের ইচ্ছা, আগ্রহ প্রকৃতিদত্ত শক্তি সামর্থ্য পছন্দ, প্রবৃত্তি ও অনুভূতি অনুযায়ী। শিক্ষা দেবার আগে প্রত্যেক শিশুকে ভালো করে জানা দরকার' (অরুণ, ১৯৮৮ : ১২)। রুশোর এ মতবাদকে বাস্তবে প্রয়োগ করে শিশুকেন্দ্রিক মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার আন্দোলন শুরু করেন পেস্টালৎসি যা আরও এগিয়ে নেন হার্বার্ট ও ফ্রয়েবল' (অরুণ, ১৯৮৮ : ১৬১)। শিশু শিক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিন্তা অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) তাঁর *ধর্ম্মনীতি* (প্রথম ভাগ, ১৮৬৯) গ্রন্থে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করেছিলেন । সেখানে তিনি দু'বছর বয়স হলেই শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। সে শিক্ষা কী এবং কীভাবে দিতে হবে সে সম্পর্কেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি পরিবার থেকে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা নির্দেশ করছেন এবং শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানোর জন্য অন্য শিশুর সঙ্গে মিশতে দেওয়ার কথা বলছেন। শিশুর শিক্ষা অর্জন বিষয়ে তিনি

'নিতান্ত শৈশব কালাবধি শিশুদিগের অন্তঃকরণকে উচিত পথে নিয়োজিত ও বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য' বলে মনে করেছেন। শিশুর মনের নানা রহস্যময়তা সুপ্ত প্রতিভা সম্পর্কে জানতেন। অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশ শিশু মনে কী প্রভাব ফেলে তা তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও বুঝেছিলেন। শিশু-মনের নানা আকার-ইঙ্গিত নিয়ে ভাবতেন, শিশুদের জন্য তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন :

> শিশুগণ যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখে, সেইরূপ শিক্ষা করে, সেইরূপ কর্ম্ম করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের চরিত্র সেইরূপ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গুরুজনদিগের যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়, তাহাদের সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব। অতএব, বালক বালিকাদিগকে সুশীল সচ্চরিত্র করিতে হইলে, জনক জননী ও শিক্ষাগুরুকেও সেইরূপ হইতে হয়। যাঁহারা পাপপঙ্কে পতিত হইয়া পরিলুণ্ঠিত হইতেছেন, তাঁহাদের কথা কি কহিব? তাঁহারা স্বীয় সন্তানগণের যত অকল্যাণ উৎপাদন করিতেছেন, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে অন্য কাহারও কর্ত্তৃক এত হইবার সম্ভাবনা নাই। দুর্ব্বাক্য কথন, অশিষ্টাচরণ, ভৃত্যাদিকে প্রহার করণ, শিশুগণকে শারীরিক দণ্ড প্রদান ইত্যাদি কতকগুলি কুরীতিও অশেষ অনর্থের হেতু। যে সমস্ত শিশু সতত এই সকল কুব্যবহার প্রত্যক্ষ করে, তাহাদের কারুণ্যরসাভিষিক্ত সুকুমার ভাবের তিরোভাব হইয়া ক্রমশঃ উগ্র ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শিশুগণকে কটু বাক্য বলা, প্রচণ্ড রূপ তাড়না ও ভর্ৎসনা করা এবং শারীরিক দণ্ড প্রদান করা অনিষ্টকর ব্যতিরেকে কদাপি ইষ্টকর নহে।' (প্রমথ, ১৩২৬ : ১৪৩-১৪৪)

অক্ষয়কুমার সেকালে বাংলা ভাষায় শিক্ষা পরিকল্পনায় শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে যে চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। তাঁর শিশু-শিক্ষার আদর্শ ও চিন্তা ছিল অত্যন্ত আধুনিক। ফলে পরবর্তীকালে তা শিক্ষাচিন্তকদের নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। শিশুদের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনায় তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে অসিতকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> আমরা যতদূর জানি এর পূর্বে শিশুশিক্ষার বিষয়ে গভীর বিস্তৃত আলোচনা করেন ফ্রোয়েবেল (ফ্রীডরিশ হ্বিল হেলন ফ্রোয়েবেল, ১৭৮২-১৮৫২), যিনি kindergerten (শিশু উদ্যান) বিদ্যালয়ের স্রষ্টা ও স্বপ্নদ্রষ্টা। প্রত্যেক মানব শিশুকে তার নিজস্ব সত্তার বিকাশে সাহায্য করা, পড়ার সঙ্গে শিশুর খেলার কঠিন বিচ্ছেদ দূর করা, কঠিন শাসনের আওতা থেকে শিশুর শিক্ষার পরিবেশকে মুক্ত করে, শিশুর কাছে বিদ্যালয়কে আনন্দময় করে তোলা, শিশুর মনের দিকে, মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তির দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত শিক্ষা দান ইত্যাদি বিষয়ে মনোবিজ্ঞান সম্মত আধুনিক শিশু শিক্ষাদর্শের জনক হিসেবে ফ্রোয়েবেল সর্বত্র সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আমরা জানি না, অক্ষয় দত্ত ফ্রোয়েবেলের চিন্তার সঙ্গে কতটা পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষাচিন্তা সে-যুগে পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর চিন্তার সহযোগী ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।' (অসিতকুমার, ২০০৭ : ৮২)

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর চিন্তায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির অনুরূপ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। 'শিশু ও বিজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি শিশুর বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত

আলোচনা করেছেন। তিনি শিক্ষার্থীর মনে প্রথমে কৌতূহল জাগ্রত করে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কথা বলেছেন :

> জ্ঞান উন্মেষের পর শিশু যখন তার চারপাশের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখে তখন মন তার চরম বিস্ময়ে ভরে ওঠে। চারপাশে যা কিছু দেখে সবই তার কাছে রহস্যময় মনে হয়, তার কৌতূহলী মনে কত প্রশ্নই না জাগে। এজন্য শিশুদের শিক্ষার ভার যাদের হাতে আছে, তাদের উচিত সাধারণত হাতের কাছে যেসব জিনিস পাওয়া যায়, যা ছোট ছেলে মেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে — যে কোন ফুল, লতাপাতা, পাখি এমন সব টুকরো জিনিসের উপর নজর দিতে শেখানো। কাজ অবশ্য শক্ত। শিক্ষকদের নিজেদের মনকে ছোটদের কৌতূহলী মনের রসে রসিয়ে নিতে হবে। তার জন্য চাই শিক্ষকদের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা অর্জন করা, যাতে তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৪০৫ : ৮৫)

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতে–'ভারি বই পড়িয়ে, বড় বড় কথা বলে শিশুর মনে আতঙ্ক জাগ্রত করা যায় অথবা কেবল পরীক্ষায় খাতায় মুখস্থ কিছু কথার উদগিরণ পাওয়া যায় কিন্তু তাতে বিজ্ঞান শেখা হয় না। তিনি চাইতেন সাধারণ তথ্যগুলির সাথে ছাত্রদের সরাসরি পরিচয় হোক' (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৪০৫ : ৮৫)। বিজ্ঞান শিক্ষাদানে তিনি 'সহজ থেকে কঠিন' এই নীতির সমর্থক ছিলেন। 'শিক্ষা নিছক তথ্য আহরণ নয়' — এ কথা তিনি বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে আমাদের বলেছেন। শিশু শিক্ষায় তিনি শিশুকে স্বাধীনতা ও আনন্দদান এবং সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে :

> প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় রাখতে গেলে শিশুর মনে সবার আগে জাগিয়ে তুলতে হবে কৌতূহল। তাদের নতুন নতুন জিনিস সংগ্রহ করার ভার নিতে হবে। হয়তো একটু আধটু রেষারেষির মধ্যেই সে সব জিনিসের চলবে সংগ্রহ, আর এমনি করেই প্রকৃতির সঙ্গে যোগটা তাদের ঘনিয়ে উঠবে। পল্লীগ্রামের স্কুলে আরও একটু সুবিধে হতে পারে। এসব ছোট ছোট কাজ সারা হওয়ার পর পেঁয়াজ ছোলা মটর যে যেমন ভালবাসে তাকে তার বাগান তৈরি করবার ভার দেওয়া। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৪০৫ : ৮৫)

আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষক শিক্ষার্থী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহায়করূপে কাজ করবেন এবং বাস্তব পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করবেন' (অরুণ, ১৯৮৮ : ১৭৩)। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষাচিন্তায় এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায় :

> বেশি বয়সের ছেলে–মেয়েরা কেন শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে? তারা নোট মুখস্থ করে, প্রশ্নপত্র চুরি করে কোন রকমে দায়িত্ব মিটিয়ে দিতে চায়। কেন তাদের এ মনোভাব? এর জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা শিক্ষকরা, আমরা তাদের সামনে বস্তুর পাহাড় তুলে ধরেছি আর চেয়েছি সেই পাহাড়ই তারা উদগিরণ করুক। বস্তুর মর্মে যে সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যের দ্বারে তো আমরা ছাত্রদের পৌঁছে দিতে পারিনি, ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে শ্রমিক ও কারখানার কর্তাদের সম্পর্কের মত। পদে পদেই তাই ছাত্ররা আজ বিদ্রোহ করে। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৪০৫ : ৮৬)

শিশুর মনে শিক্ষাকে দৃঢ় করার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন : 'গাছপালা, জন্তু জানোয়ার সবের মধ্যেই শিক্ষণীয় জিনিস রয়েছে। প্রত্যেকেই আমাদের সত্য স্বরূপে পৌঁছে দিতে চায়। আমাদের মধ্যে যদি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা যদি জাগ্রত হয়, তবে আর সবকিছুই সহজ হয়ে আসবে। তখন শিক্ষা দেবার পদ্ধতি নিয়ে আর গোলে পড়তে হবে না' (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৪০৫ : ৮৫)। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের বিষয়েও তিনি আধুনিক বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। শিশুর মনে শিক্ষাকে দৃঢ় করার জন্য আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও শিশু শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ছায়াচিত্র, ভ্রমণ প্রভৃতির ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়েও তিনি মতামত দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু একান্তভাবেই চাইতেন দেশে বাংলা ভাষায় শিশুকেন্দ্রিক প্রগতিশীল ও মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করতে। তিনি চেয়েছেন শিক্ষাদানে বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে কৌতূহল জাগ্রত করে শিক্ষা দেওয়া হোক। বিজ্ঞান শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন 'সহজ থেকে কঠিন' নীতির সমর্থক। এ ছাড়াও তিনি কাজের মধ্য দিয়ে, শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে, বাস্তব পরিবেশ থেকে ও অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। আর এসব কাজের জন্য শিক্ষার্থীর কাছে মাতৃভাষা বাংলাই হচ্ছে সহজতম মাধ্যম। কারণ শিক্ষার্থীর মনে বিভিন্ন ধারণা, মনোভাব, মানসিক সংগঠন, চিন্তার উপাদান সবই বাংলা ভাষায় কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। শিশু যখন নতুন কিছু দেখে, শোনে, বোঝে বা জানে তখন তা সে তার মনের এই উপকরণগুলোর সাহায্যেই করে। তাই শিক্ষার্থীর কাছে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই নতুন কিছু শেখা সবচেয়ে সহজ।

W M Ryburnএর ভাষায়, The mother tongue is at once a tool, source of joy and happiness and knowledge, a director of taste and feeling and a means of using the highest powers that God has given us where we closer to Him; that is, our creative powers. অর্থাৎ শিশুর জ্ঞানার্জনের সহজতম হাতিয়ার হচ্ছে মাতৃভাষা। পাশাপাশি বিদেশি ভাষায় শিশুর পক্ষে নতুন জ্ঞান অর্জন খুবই কষ্টকর। কারণ, নতুন জ্ঞান অর্জনের পূর্বে তাকে অপরিচিত নতুন একটি ভাষাও শিখতে হয় যা তার জন্য কষ্টসাধ্য। এভাবে জ্ঞানার্জনে মাতৃভাষার গুরুত্বের কথা দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, মনীষী সবাই স্বীকার করেছেন। 'শুধু ভাবের আদান-প্রদানেই নয়, জ্ঞানের আদান-প্রদানেও মাতৃভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ কারণে সব দেশের শিক্ষাক্রমে মাতৃভাষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ, মাতৃভাষায় যত কম সময়ে যত সহজে জীবন উপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায় তা মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় সম্ভব নয়।' (এহসান-শ্যামলী-রশিদ, ২০০৩ : ৯৬)

জনশিক্ষা বিস্তারে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলা ভাষায় জনশিক্ষা বিস্তারের সহজ পদ্ধতি দেখাতে গিয়ে তাঁর জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, জাপানে

বিজ্ঞানের আধুনিকতম দিকগুলো পড়ানো হয় জাপানি ভাষায়, বিজ্ঞান বিষয়ের সেমিনারে আলোচনাও হয় জাপানি ভাষায়। এজন্য ইংরেজি না জানা জাপানিরাও বিজ্ঞানের বিষয় সহজে জানতে পারছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

> বিশ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জাপানের হার হল, তখন জাপানের দুরবস্থার শেষ ছিল না, আজ কিন্তু জাপানে গেলে মনে হবে না যে এরকম কোনো অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে — এত অল্প সময়ে দেশের সেই দুরবস্থা থেকে বর্তমান এই অতি-সম্পদের মধ্যে কী করে জাপান আবার উঠে দাঁড়াল। শিক্ষা ও উন্নতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি তাই চেষ্টা করেছিলাম জানতে যে, সেখানে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা কীরকমভাবে হয়েছে। [...] আমার প্রথমে ধারণা ছিল যে হয়তো কোনো একটা বিদেশী ভাষার উপর নির্ভর করে জাপানে বিজ্ঞান কিংবা শিল্পকলা শেখানো হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম যে আমার ধারণা ভুল। আমি অনেক বই যোগাড় করেছিলাম। তার অধিকাংশই জাপানিতে লেখা।
>
> একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন জাপানিরা। সেখানে শিক্ষিত লোকেরা যাঁরা দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা শিক্ষক, তাঁরা সকলে একত্র হয়েছিলেন আলোচনা করতে যে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে মানুষের কী করা উচিত এবং মানুষের ভবিষ্যৎই-বা কী হবে। সম্মেলনে আমি এবং আরও দুএকজন বিদেশী ছিলেন, কিন্তু বেশির ভাগই জাপানের লোক এবং আলোচনা যা হয়েছিল তা সমস্তই জাপানিতে। তাঁদের দুএকজন ইংরেজি ভাষাতে কিছু কথা বললেও পরে আলোচনা যা হল সবই জাপানি ভাষায়। এটা বললে ভুল হবে যে, তাঁরা ইংরেজি জানেন না। কেননা, আমরা যখন ইংরেজি বলি তখন তাঁরা প্রায় সকলেই বোঝেন। তবে তাঁদের মনে এমন বিশ্বাস ছিল না যে, ইংরেজি বললে নিজের মনের ভাব স্পষ্ট করে বোঝাতে পারবেন। সেইজন্য যেসব বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই জাপানি ভাষাতেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। দেখা গেল, শুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা বর্তমান বিজ্ঞানের উচ্চস্তরের কথা সবই জাপানি ভাষায় বলা সম্ভব এবং জাপানি কথায় তা বলবার জন্য লোকে ব্যগ্র। (তপন, ২০০৬ : ৭৯-৮০)

বাংলা ভাষার তুলনায় জাপানি ভাষার কতকগুলি অসুবিধা লক্ষ করা যায়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা শিখতে এক বছরের বেশি লাগে না। আর জাপানিদের তাঁদের মাতৃভাষা শিখতে গড়ে সময় লাগে প্রায় ছয় বছর। এর কারণ তাঁদের নিজেদের অক্ষর এবং প্রায় হাজার চৈনিক অক্ষর শিখতে হয়। অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের ভাষা শেখে এবং চর্চা করে। জাপানি বিজ্ঞানী, জাপানি দার্শনিক নিজেদের মনের প্রত্যেকটি কথা নিজের ভাষায় প্রকাশ করেন। তাঁরা শিক্ষাবিস্তারে নিজের ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়ায় এত অল্প সময়ে নিজেরা উন্নতির মুখ দেখেছেন। ফলে তাঁদের দেশের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যখন চালু হয়, তখন তার জন্য শিক্ষক পাবার কোনো অসুবিধা হয়নি এমন শিক্ষক যিনি জাপানি ভাষায় বিজ্ঞান কিংবা দর্শন কিংবা অন্যান্য কলাবিদ্যা আয়ত্ত করে নিয়েছেন ও পড়াতে পারেন। ফলে জাপানে দ্রুত শিক্ষাবিস্তার হয়েছে এবং তাঁরা সহজেই সমস্ত জ্ঞান আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছেন। তাই তিনিও

চেয়েছিলেন এদেশের মানুষকে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিলে সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তার সহজ হবে। তিনি বলেছেন :

> এটা ঠিক যে দেশ বলতে যদি দেশের লোককে বোঝায়, শিক্ষিত বা নায়ক-সম্প্রদায় না হয়, যদি মনে হয়, দেশে সাধারণ লোকই দেশ, তবে এরা শিক্ষিত হলেই তো দেশকে উন্নত বলা যাবে এবং দেশকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য সমূহ শক্তিই তাদের হাতের মধ্যে থাকবে। [...] আমার মনে হয় যে প্রথমেই আমরা সারা দেশের কথা না ভেবে যদি আমাদের নিজেদের ঘর তৈরি করি, অর্থাৎ আমরা যে-প্রদেশে থাকি সেই প্রদেশের লোকের শিক্ষার এমনভাবেই বন্দোবস্ত করি যাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর কাছে পৌছায়, তা হলে আমাদের সামনে নতুন যে-সমস্ত অসুবিধা দেখা যাচ্ছে সেটা সহজেই চলে যায়। (তপন, ২০০৬ : ৮০)

‘বিজ্ঞান পরিচয়’ পত্রিকা প্রকাশ

বিশ্বপরিচয়-এর উৎসর্গ নামায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথের সে কথা ভুলে যাননি। তিনি ঢাকায় থাকাকালে বাংলা ভাষায় ‘বিজ্ঞান পরিচয় পত্রিকা’ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ানোর সময় শ্রেণিকক্ষে এবং বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে, ‘এ দেশের বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান শুধু জানলেই চলবে না, বিজ্ঞান বোঝে না এমন লোকদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টাও থাকা উচিত তাঁদের’ (অরুণ, ১৯৮৮ : ১৩৭)। তিনি জনসমাজকে বিজ্ঞানসচেতন করা, জনকল্যাণে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটানো এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার প্রচলন করা প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কলকাতায় ‘বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ লক্ষ্য অর্জনে পরিষদের মুখপাত্ররূপে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকায়ই ১৯৬৩ সালে কেবল মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ নিয়ে রাজশেখর বসু সংখ্যা প্রকাশ করে তিনি দেখান যে, ‘বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধ রচনা সম্ভব’ (অরুণ, ১৯৮৮ : ৮)। সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান পরিষদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লিখেছেন এবং তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষে আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এ থেকেই অনুমান করা যায়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে তিনি কতটা আন্তরিক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্রাহীম লিখেছেন :

> শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শুধু ইচ্ছে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগই যে যথেষ্ট নয় তা তিনি ভালভাবেই জানতেন, এজন্য তিনি যেমন সর্বমহলে সোচ্চার হয়েছিলেন তেমনি এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের সংশোধন, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অনুবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজেও যত্নবান ছিলেন।’ (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৪০৫ : ৭৬)

উপসংহার

সত্যেন্দ্রনাথ বসু মনে করতেন, সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে বাংলা ভাষার বিকল্প নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁর এ মত অভিন্ন ছিল। তিনি দেখিয়েছেন, বিজ্ঞান শিক্ষা বিকাশে মাতৃভাষা বাংলা অত্যন্ত সহায়ক। জনসাধারণকে বিজ্ঞানসচেতন করা ও বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে প্রধান মাধ্যম করতে চেয়েছেন। এ কারণে তিনি বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যুক্তিনির্ভর হয়েছেন। তিনি নিজে তাঁর ছাত্রদের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সমাজের জন্য একজন দায়িত্বশীল মানুষ ছিলেন। ‘মানুষ সামাজিক জীব বলেই সমাজের প্রতি সে এক ধরনের দায় অনুভব করে। শিক্ষিত সম্প্রদায় স্ব–সমাজের প্রতি সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিকতর দায়িত্বশীল। ... বিজ্ঞানচর্চার বাইরে ব্যক্তি সত্যেন্দ্রনাথ সামাজিক সত্যেন্দ্রনাথে পরিণত হন’ (আলম-মাহবুব, ২০০৫ : ৯৫)। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে মানবতার পতাকাতলে আহবান করেছিলেন। তিনি বলেছেন :

> আমাদের জাতীয় পতাকা জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরার জন্য যদি আমরা মিলিতভাবে চেষ্টা করি তাহলে ছোট খাটো ভুল বুঝাবুঝি ও নির্বোধ ঈর্ষা নিশ্চিতই সহজে দূর করা যাবে। কেবলমাত্র বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র্য এবং সামাজিক ও বংশ মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক, এ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষই যে পরম সত্য আমাদের সেই জ্ঞান হোক। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৪০৫ : ১১১)

সত্যেন্দ্রনাথ বসু খ্যাতিমান বিজ্ঞানী হয়েও ছিলেন একজন অসামান্য শিক্ষাচিন্তক। তাঁর শিক্ষাচিন্তা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের পক্ষে তাঁর যুক্তিনির্ভর ইতিবাচক বক্তব্য জ্ঞান আহরণকারীদের উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

তপন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ২০০৬। *সত্যেন্দ্রনাথ বসু*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ১৪০৫। *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন*, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা।

যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৩৮৪। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (চরিতমালা তৃতীয় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), ১৩৮৯। *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: শিক্ষাচিন্তা*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

তপন চক্রবর্তী, ১৯৮৬। *সত্যেন্দ্রনাথ বসু*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২০১২। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, সম্পাদক পিনাকপাণি দত্ত, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অরুণ ঘোষ, ১৯৮৮। *শিক্ষা বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব*, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজেস, কলিকাতা।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য, ২০০৭। *অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজচিন্তা*; কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা।

প্রবন্ধপঞ্জি

প্রমথ চৌধুরী, ১৩২৬। ‘আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবন-সমস্যা’, *সবুজপত্র*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ড. রীণা ভাদুড়ী (সম্পাদিত), ২০০৭। *অপরাজিত*, বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ২৭ সংখ্যা : জানুয়ারি-জুন, কলকাতা।

মোঃ আবুল এহসান, শ্যামলী আকবর, মোহাম্মদ মনিনুর রশিদ, ২০০৩। “প্রাথমিক স্তরের পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের শব্দ আয়ত্তীকরণ প্রক্রিয়া : একটি সমীক্ষা”, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ঢাকা।

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী ও মাহবুব আহসান খান, ২০০৫। ‘সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষাচিন্তা’, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন ও ডিসেম্বর, ঢাকা।

স্বপনকুমার দাস, ২০০৭। ‘আশুতোষ ও বিজ্ঞান শিক্ষা’ (প্রবন্ধ), *অপরাজিত*, বর্ষ ২৭ সংখ্যা : জানুয়ারি-জুন, কলকাতা।